বাংলায়

লেখনী

বাঙালির সংগীতচর্চা

বাঙালির সংগীতচর্চা এক অনন্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক। সংগীত বাংলার মানুষকে শুধু বিনোদনের মাধ্যমেই একত্র করেনি, বরং এটি তাঁদের আত্মার সঙ্গে মেলবন্ধনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্রামীণ বাংলার লোকগীতি থেকে শুরু করে শহুরে আধুনিক সংগীত—প্রতিটি ধারাই বাঙালির জীবনযাত্রার সাথে গভীরভাবে জড়িত।

"ভূবনো মোহনো গোরা
কোন মণিজনার মনোহরা"

লোকসংগীত বাঙালির সংগীতচর্চার মূল শিকড়। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি-সারি ও কবিগান বাংলার গ্রামীণ সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এগুলোর বিষয়বস্তু প্রকৃতি, প্রেম, দৈনন্দিন জীবন এবং আধ্যাত্মিকতা। গায়কদের সরল কথনশৈলী ও সুরের গভীরতা এই সংগীতগুলোকে কালজয়ী করেছে।

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালির সংগীতচর্চায় এক বিপ্লবের সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে প্রকৃতি, মানবপ্রেম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার মানুষের মননে এমনভাবে জায়গা করে নিয়েছে যে এটি এখন বাঙালির পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছে। একইভাবে, কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি নজরুলগীতি বিদ্রোহ ও মানবিকতার বার্তা বহন করে।

উনিশ ও বিশ শতকের সময়কালে বাংলা আধুনিক সংগীতও জনপ্রিয়তা পায়। এই ধারায় বাংলা চলচ্চিত্র ও আধুনিক গানের সংযোগ ঘটে, যা বাঙালির আবেগ ও জীবনের প্রতিফলন ঘটায়। শচীন দেব বর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর প্রমুখ শিল্পীরা এই ধারার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

বর্তমান সময়ে বাঙালির সংগীতচর্চা বহুমাত্রিক। রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগান এবং আধুনিক গানের পাশাপাশি ফিউশন মিউজিক, ব্যান্ড সংগীত এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা সংগীতকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলছেন। শিলাজিৎ, অনুপম রায়, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা নতুন ধারার গান পরিবেশন করে বাঙালির সংগীতচর্চাকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছেন।

বাঙালির সংগীতচর্চা এক গভীর ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি, যা কালের স্রোতে ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে। এটি কেবল বিনোদন নয়, বরং সংস্কৃতি, সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই বাঙালির সংগীতচর্চা একটি ঐতিহ্য, যা অতীতের শিকড় ধরে রেখেও ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

Debopom Mitra
XI B

মা

"অহি- নকুল সম্পর্ক"। ব্যাকরণ বই তে পড়েছি যে এই বাগধারাটির অর্থ হলো এক অতি শত্রুতার সম্পর্ক। আমার বিশ্বাস যে যদি কেউ আমাদের বাড়ির দৈনিক দৃশ্যটির মুখোমুখি হয়, সবাই বলবে যে আমার এবং আমার মায়ের মধ্যে ঠিক তেমনি এক সম্পর্ক, যদিও তা যে সত্যি তাও নয়, আবার মিথ্যে তেমনও নয়।

ছোটবেলা থেকেই মা ছিল এক সেলিব্রিটি। আমার বন্ধু এবং তাদের মায়েদের মধ্যে তার খ্যাতির কোনো শেষ ছিল না। আমার শ্রেনীর যে কোনো ছাত্রকেই জিজ্ঞেস করলে তারা এক কথায় চিনে নিতে পারত "রেহান - এর মা" - কে। এবং কেবল বন্ধুরা নয়, এমনকি বেশ কয়েকজন টিচাররাও খুব ভালো ভাবেই পরিচিত ছিল মায়ের সাথে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো, এমন খ্যাতির মূল কারণ টা কি? একটি শব্দ: শাসন। আমার প্রত্যেকটি বন্ধু মাকে যমের মতন ভয় পেতো, কিছু জন আজও পায়। আমি খেলাধূলা ভালোবাসি, আমার বন্ধুরাও বাসে। আমরা মাঝে মাঝেই সময় পেলে খেলতে যাবার পরিকল্পনা করি। কিন্তু প্রত্যেক বারই এই পরিকল্পনা গুলোর সবচেয়ে কঠিন অংশটি হতো "রেহান - এর মা" - কে রাজি করানো। আমার খেলতে যেতে পারাটা ছিল ঠিক গণিতের একটি 'variable', অর্থাৎ পরিবর্তনশীলের মতন, সেটা নির্ভর করত একমাত্র আমার মায়ের ওপর। অনেক বারই এরকম হয়েছে যে বন্ধুরা মিলে ঘন্টাখানেক পরিকল্পনা করেছি এই নিয়ে যে আমার মাকে কিভাবে মানানো যায়। কখনও কখনও মা খুবই সহজে মেনে যেতো,
আবার কখনও কখনও একাধিক দিনের সংগ্রামের পরেও আমরা সফল হতে পারতাম না।

একবার দশম শ্রেণীতে আমি ক্লাসে দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই, তাই class teacher আমার মায়ের সাথে কথা বলতে চায়। বাড়ি গিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে মাকে একথা জানাই। মা উত্তর দিয়ে দেয়, "যেতে পারব না, অফিস আছে"।

তখন আমি বলি মাকে, “তাহলে তুমি class teacher ke একটা চিঠি লিখে দেবে?” উত্তরে মা প্রথমে আমার দিকে কড়া চোখে তাকায়, তারপর একটি চিঠি লিখে দেয়। পরেরদিন স্যার কে সেই চিঠি দেওয়ায় স্যার কেমন একটা হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আমাকে চিঠিটা ফেরত দিয়ে দেয়। নিজের টেবিলে গিয়ে বসে চিঠিটা খুলে দেখি। যা লেখা ছিল, তার সারমর্ম কিছুটা এরকম:

“স্যার, আপনার দুটো হাত আছে। আমার ছেলেকে মানুষ করতেই আমি তাকে স্কুলে পাঠাই। হাতের সদ্ব্যবহার করতে কখনও দ্বিধা করবেন না।“ সেটার পর স্কুল - জীবনে স্যার আর কখনো আমার মা বাবার প্রসঙ্গ তোলেননি।

চিরকালীন, মায়ের অফিস থেকে বাড়িতে ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন হয় যে আমি পড়ছি কি না। তারপর, মা আমার দিদার কাছ থেকে খবর নেয় যে আমি গোটা দিন আদৌ পড়েছি কি না। এইসবে আমি বেশ বিরক্তই হতাম, কিন্তু মায়ের যে এই চিন্তা যথাযথ ছিল না, সেটা বলাও ভুল। মা সবসময়ই চেয়েছে যে আমি জীবনে বড় কিছু করি, তাই নিজের দিক থেকে যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে, মা তার সব চেষ্টা করে। তাই দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আমার ভালো পড়াশুনা ও ভালো রেজাল্ট করার খবরই তার একমাত্র পাওনা। তার অতি শাসনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে চিন্তা ও ভালবাসা। সাংসারিক বা অর্থনৈতিক কোনো চাপই মা আমায় কখনও বুঝত দেয়নি, আমার সব শখ পূরণের চেষ্টা করেছে। এবং তাই হয়তো মায়ের ওপর কখনোই আমি বেশিক্ষণ রেগে থাকতে পারি না।

সব মায়েরা এক না হলেও তারা দিনের শেষে এক। তারা সবাই যাই করে, তাদের সন্তানের কথা প্রথমে ভেবে করে। তারা আমাদের ভালোবাসে নিঃস্বার্থভাবে। যদিও এই ভালবাসার পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন, তবুও বিশ্বের আর কোনো ভালবাসাই তার সাথে পাল্লা দিতে পারবে না, কখনোই না।।

Rehan Alam

XII S

পলাশী

পলাশীর সে রণভূমি অস্ত বঙ্গসূর্য
রক্তের দাগে মাখা, করেছি তাহাকে বর্জ্য
গঙ্গাজলে ভেসে গেল অস্তি চিরদিনের জন্য
ইতিহাসের বাণী ভুলে কিনবো বিস্মৃতির পণ্য।

পলাশীর যুদ্ধ—১৭৫৭ সালের সেই ভয়াবহ দিনটি—বাংলার ভাগ্যকে চিরদিনের জন্য বদলে দিয়েছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজের অনভিজ্ঞতা এবং মূর্খামি তথা বিশ্বাসঘাতকতার বাণে পরাজিত হয়েছিলেন। সেই দিনটি শুধু বাংলার ইতিহাসের নয়, ভারতবর্ষের গতিপথকে এক নতুন দিকে নিয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সম্পদ দখল করে তার মাধ্যমে পুরো ভারতকে নিজেদের শাসনের অধীনে নিয়ে আসে। কিন্তু আজ সেই পলাশীর স্মৃতি যেন সময়ের ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেছে।

আমি ২০২৪এর ২৫শে ডিসেম্বর বহরমপুর থেকে পলাশীর পথে রহনা হই । রাস্তায় যাওয়া কালীন বারবার গাড়ির চালক ইঙ্গিত করেন যে পলাশী ঘুরতে যাওয়া বেকার এবং সেখানে দেখার মতন কিছুই নেই। পৌঁছে সত্যিই দেখা গেলো কিছুই নেই।
একটি শ্বেতপাথরের তৈরী স্তম্ভ পলাশীর যুদ্ধের স্থান ইঙ্গিত করার জন্য। অথচ কিছু পুরোনো ছবি, এবং কিছু স্থানীয়দের থেকে জানা যায় যে পলাশীর আসল আমবাগান কেটে এখন ওখানে সর্ষে চাষ হয়। ফলে, ভারতের ইতিহাসের বাঁক ঘুরিয়ে দেওয়ার এই ঘটনাটি যেখানে ঘটিত হয়েছিল সেখানে এখন সর্ষে গজায়।

ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভটি ১৯৭৩ সালে উদ্বোধনের পরে সংস্কার করা হয়নি। এটি আজ সময়ের ক্ষয়ে তার চেহারা হারিয়েছে। এমন একটি ঘটনা, যা আমাদের জাতীয় পরিচয় এবং সংগ্রামের ইতিহাসে গভীর ছাপ ফেলেছিল, আজ তার স্মৃতিচিহ্নও যথাযথ সম্মান পায় না।

এই অবহেলা আমাদের জাতিগত স্মৃতির প্রতি এক নিষ্ঠুর অবজ্ঞার প্রকাশ। ইতিহাস আমাদের পরিচয়, আমাদের শিক্ষা। আজকের প্রজন্মের কাছে পলাশী শুধু ইতিহাস বইয়ের একটি অধ্যায়, যার গভীরতা ও গুরুত্ব তাদের কাছে অধরা।

এই অবজ্ঞা কেবল পলাশীর স্মৃতি নয়, বরং আমাদের জাতীয় চেতনার জন্যও একটি বড় আঘাত। যখন আমরা আমাদের অতীত ভুলে যাই, তখন আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলি। আজকের শিক্ষার্থীরা পলাশীর নাম শুনলেও এর অর্থ বোঝে না। ইতিহাসের প্রতি এই উদাসীনতা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিকড় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

পলাশীর যুদ্ধ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও এই শিক্ষা প্রাসঙ্গিক। আমরা যখন আমাদের অতীতকে ভুলে যাই, তখন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো ভুল পথে পরিচালিত হয়। আমাদের উচিত এই ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তার গুরুত্ব তুলে ধরা।

পলাশীর স্মৃতি কেবল আমাদের অতীতের নয়, এটি আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি শিক্ষা। এই স্মৃতিস্তম্ভ যেন শুধু পাথরের নয়, একটি চেতনার প্রতীক হয়ে ওঠে। আমাদের ইতিহাসকে স্মরণ করে, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করতে পারি। অতীতের অন্ধকারে আলোর সঞ্চার ঘটিয়ে আমরা আমাদের শিকড়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি। স্মৃতির পথে জাগাও আলো, তবেই হবে নতুন সূচনা, ভাঙবে সময়ের বাধা।

ইতিহাস বলে, শিখতে হবে, ভোলা যায় না অতীত,
অতীত যদি হয় ছিন্ন, ভবিষ্যৎ হয় পরিপ্রেক্ষিত।
পলাশীর গৌরব আজও, ডাক দিয়ে যায় প্রাণে,
শিকড় ভুলে কেউ এগোয় না, কালের পাঁজরে টানে।

Ipshito K Ghosh
XI A

বাংলার রূপোলি পর্দার মহাকাব্য উত্তম ও সুচিত্রা

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের নাম দুটি শুধু স্মৃতি নয়, বাঙালির আবেগ এবং ভালোবাসার প্রতীক হয়ে রয়েছে। তাঁদের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করলেই যেন সময় থমকে যায়, যেন রুপোলি পর্দা আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। উত্তম-সুচিত্রার পর্দার রসায়ন শুধুই ছায়াছবির অংশ ছিল না; সেটি ছিল এক ধরনের জাদু- এমন এক জাদু, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালির হৃদয়ে রয়ে গেছে। তাঁদের যুগলবন্দী কেবল রুপোলি পর্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি বাঙালির জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিল।

উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করেন "সাড়ে চুয়াত্তর" ছবিতে। এটি ছিল মজার, খুনসুটিতে ভরা এক হালকা গল্প। তবে সেই ছবির প্রতিটি মুহূর্তে লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের এক মহানায়ক-মহানায়িকার আবির্ভাবের পূর্বাভাস। দর্শকেরা সেই হাসির মুহূর্তের মাঝেই তাঁদের যুগলবন্দীর মধ্যে এক অনবদ্য সুর খুঁজে পেয়েছিল। এরপর আসে "অগ্নিপরীক্ষা" ছবিটি শুধু সফলই হয়নি; এটি বাংলা ছায়াছবির রোমান্টিক ঘরানার এক মাইলফলক হয়ে ওঠে। এই ছবিতে উত্তম-সুচিত্রার আবেগঘন অভিনয় এমন এক উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যেখানে দর্শকেরা তাঁদের পর্দার বাইরেও বাস্তব জীবনের যুগল ভেবে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

উত্তম-সুচিত্রার রসায়নের সৌন্দর্য ছিল তাঁদের পরস্পরকে অনুভব করার ক্ষমতায়। সুচিত্রা সেনের চোখের ভাষা, তাঁর নীরবতা, তাঁর হাসির সূক্ষ্মতা যেন উত্তমের প্রতিটি অভিব্যক্তির সঙ্গে বাঁধা ছিল। উত্তম কুমারের চোখের গভীরতা, তাঁর সংলাপ বলার ভঙ্গি, আর সেই আত্মবিশ্বাস– এই সবকিছু মিলিয়ে তাঁদের যুগলবন্দি হয়ে উঠেছিল এক অনন্য সৃষ্টি।

"সপ্তপদী" ছবিতে যেমন রিনা ব্রাউন এবং কৃষ্ণেন্দু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের প্রশ্নে প্রেমের সত্যতা প্রমাণ করেছে তেমন মোটর বাইকে সেই বিখ্যাত দৃশ্য 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গান বাঙালির মনে রোমান্টিকতার উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থেকে গেছে । এটি ছিল প্রেমের এক শুদ্ধ প্রতিমা, যেখানে ব্যক্তিগত আবেগ আর মানবিকতার লড়াই একাকার হয়ে গিয়েছিল।

তাঁদের প্রতিটি ছবিই একেকটি আবেগঘন অধ্যায়। "হারানো সুর" ছবিতে অতীতের প্রেম আর বর্তমানের বাস্তবতার সংঘর্ষ এক গভীর ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। উত্তম-সুচিত্রার অভিনয়ে সেই ব্যথা ছিল বাস্তব, যেন এটি শুধুই গল্প নয়, দর্শকদের নিজেদের জীবনের অংশ।"পথে হলো দেরি"-তে দেখা যায় মনের দ্বিধা আর ভালোবাসার টানাপোড়েন। সুচিত্রার চরিত্রের নীরব অশ্রু আর উত্তমের চরিত্রের আভাসে লুকানো আবেগ দর্শকদের চোখে জল এনেছিল। "সাগরিকা"-তে তাঁদের প্রেম ছিল এক স্বপ্ন, যেখানে বাস্তবতা আর কল্পনার সীমানা মুছে গিয়েছিল।

উত্তম-সুচিত্রার যুগলবন্দী নিয়ে দর্শকেরা এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক নিয়েও জল্পনা শুরু হয়। কিন্তু তাঁরা ছিলেন পেশাদার অভিনেতা– পর্দায় তাঁদের রসায়ন যত গভীরই হোক, বাস্তবে তাঁদের সম্পর্ক কেবল শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে তাঁদের অভিনয় এমনই জীবন্ত ছিল যে দর্শকেরা সেই বিভাজন মানতে পারতেন না।

উত্তম-সুচিত্রার যুগলবন্দী আজও বাংলা সিনেমার এক চিরন্তন অধ্যায়। তাঁদের ছবিগুলো শুধু এক সময়ের স্মৃতি নয়; এটি বাঙালির আবেগ, ভালোবাসা, আর জীবনের অংশ। যখনই "অগ্নিপরীক্ষা," "সপ্তপদী" বা "সাগরিকা" টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়, তখন নতুন প্রজন্মও সেই একই আবেগ নিয়ে তা দেখে। তাঁদের জুটি নতুন প্রজন্মের কাছে শুধুমাত্র প্রেরণা নয়, এটি একটি চিরকালীন ভালোবাসার প্রতীক।

উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন কেবল বাংলা ছায়াছবির দুই নাম নয়; তাঁরা এক আবেগ, এক ইতিহাস। তাঁদের যুগলবন্দী শুধুমাত্র এক সময়কে সংজ্ঞায়িত করেনি; এটি বাঙালির ভালোবাসার ধারণাকেই নতুন করে গড়ে তুলেছে।

তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি নীরবতা আজও বাঙালির হৃদয়ে অনুরণন তোলে। বাংলা সিনেমার এই দুটি নাম চিরকাল অমলিন থাকবে। রুপোলি পর্দার বাইরেও তাঁদের ভালোবাসার সেই মহাকাব্য বাঙালির মননে অনন্তকাল ধরে বাজতে থাকে।

Debanjan Nayak
XI A

বসন্ত এসে গেছে

এলো বসন্ত, সাজলো বাগান ফুলে,
নানাদিকে ফলের সমাহার, খাওয়ার অপেক্ষা রাখে,
পলাশের রঙে রাঙা হল চারপাশ।
কোকিলের কুহু ডাক, সুরের ঝঙ্কার
মনের কোণে জাগল নতুন সব আশা।

নতুন পাতা, নতুন কুঁড়ি সবুজে সব ভরা,
দক্ষিণ বাতাসে ভেসে আশে বসন্তের গন্ধ।
গাছের ডালে ডালে বাজে সংগীত,
প্রকৃতি আজ যেন নাচছে আনন্দে।

হে বসন্ত রানি প্রার্থনা করি,
আমাদের জীবন ভরে উঠুক সুখ ও শান্তিতে,
এবার সেন ভুলতে পারি সকল বিষাদ ভরা কথা
বসন্ত এলো দ্বারে, হৃদয় জানুক আশা।

Tamoghno Ghosh
IX A

পড়াশোনার চাপ

আমি এক ছাত্র, স্বপ্নের যাত্রী,
তবু বইয়ের ভারে যেন জীবন আঁধারি।
প্রত্যেক সকালে ঘুম ভাঙে ভয়ে,
পরীক্ষার প্রশ্ন যেন ছুরি হাতে রয়।

বাবা-মায়ের আশা, শিক্ষকের চাহনি,
বড় হতে হবে, নেই পিছুটানি।
কিন্তু ক্লান্ত মনে হারিয়ে যায় দিশা,
চাপে থেমে যায় মনের আনন্দের দিশা।

বন্ধুরা বলে, 'মজা কর, একটু ঘুরে আসি,'
কিন্তু বইয়ের পাহাড়ে সময় হারাই খাসি।
রাত জেগে পড়ি, চোখ হয় লাল,
তবুও ভয় ধরে, যদি ফল হয় কাল।

লেখাপড়া তো দরকার, আমিও জানি,
তবে কেন এত চাপ, প্রশ্ন করি আমি।
জীবন কি শুধু নম্বর আর পরীক্ষার খেলা?
নাকি এতে আছে হাসি, গল্প, মেলা?

পাঠ্যবইয়ের পাতা, সিলেবাসের দলা,
শৈশবের হাসি যেন মুছে ফেলা।
স্বপ্ন দেখি একদিন, চাপ হবে কম,
পড়াশোনা হবে মধুর, আনন্দে ভরে মন।

Rupayan Ghosh
VIII B

একটি রহস্যময় রাত

চাঁদহীন রাত। চারপাশে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। বাতাসে এক অজানা শীতলতা অনুভূত হচ্ছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে পুরানো বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন অরুণবাবু। তাঁর চোখে এক ধরণের ভয় আর কৌতূহল মিশে আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের পঞ্চায়েত ভবনে আলোচনা চলছিল। গ্রামের বেশ কিছু মানুষ একের পর এক নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল। কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। আলোচনা শেষে অরুণবাবু সিদ্ধান্ত নেন তিনি আজ রাতেই সেই পুরানো বাড়িটিতে যাবেন, যেটি কয়েক শতাব্দী ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয় লোকেরা বলেন, ওই বাড়িতে নাকি অলৌকিক কিছু আছে।

অরুণবাবু গ্রামের একজন প্রবীণ ইতিহাসবিদ। তিনি যুক্তিবাদী মানুষ। ভূত-প্রেতের গল্পে তাঁর বিশ্বাস নেই। কিন্তু আজকের ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গভীর রাতে, হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে তিনি রওনা দেন।

বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, দূরে সেই পুরানো বাড়ির জানালায় মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে। এত বছর পর কীভাবে আলো জ্বলছে, সেটাই অদ্ভুত। তিনি ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগোলেন। বাতাসের শব্দ, রাতের পোকামাকড়ের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

বাড়ির দরজায় হাত দিতেই এক হিমেল বাতাস তাঁর মুখে লাগল। দরজাটি নিজে থেকেই খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করতেই চারপাশের দেয়ালে ছোপ ছোপ দাগ, ছাদের কোণায় ঝুলের স্তূপ, যেন শতাব্দীর পুরনো ইতিহাস বহন করছে। হঠাৎ করেই একটি ফিসফিস শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। শব্দের উৎস খুঁজতে খুঁজতে তিনি উপরের দিকে তাকালেন। সিঁড়ি বেয়ে উপরের তলায় উঠতে শুরু করলেন। প্রতিটি ধাপে যেন সময় থমকে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করে একটি দরজা থেকে আলো ফুটে বেরোল। অরুণবাবু দরজাটি খুলতেই দেখলেন, ঘরের এক কোণে বসে আছে একজন অচেনা বৃদ্ধ। চোখ

দুটি অস্বাভাবিক লাল, যেন রক্তের আভা। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বললেন, 'অবশেষে তুমি এলে! আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম।'

অরুণবাবুর গলা শুকিয়ে গেল। তিনি ধৈর্য ধরে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে? এখানে কী করছেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'আমি এই বাড়ির শেষ উত্তরাধিকারী। বহু বছর আগে এখানে এক ভয়ঙ্কর অপরাধ হয়েছিল। আমার পূর্বপুরুষরা সেই পাপের শাস্তি ভোগ করছেন। আজও তাঁদের আত্মারা মুক্তি পায়নি।'

অরুণবাবু হতবাক। তিনি আরেকবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু গ্রামের লোকেরা নিখোঁজ হচ্ছে কেন? এর সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

বৃদ্ধ গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাদের আত্মারা মুক্তি চাইছে। তারা যেকোনো মূল্যে তাদের ব্যথা জানাতে চায়। তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

এই বলে বৃদ্ধ একটি পুরনো পাণ্ডুলিপি অরুণবাবুর হাতে তুলে দিলেন। পাণ্ডুলিপিটি খুলতেই অদ্ভুত প্রতীক ও মন্ত্র লেখা ছিল।

হঠাৎই জানালার বাইরে ঝড় শুরু হল। মোমবাতি নিভে গেল। ঘরের তাপমাত্রা আরও নেমে এল। দরজার বাইরে যেন কারো পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অরুণবাবু দ্রুত পাণ্ডুলিপিটি পড়া শুরু করলেন। অদ্ভুত ভাষা, কিন্তু পড়ার সাথে সাথেই যেন চারপাশের সবকিছু স্থির হতে শুরু করল।

শব্দ বন্ধ হলো। বাতাস থেমে গেল। বৃদ্ধ হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখনই অরুণবাবু বুঝলেন, এটা ছিল অতৃপ্ত আত্মার শেষ আহ্বান।

পরদিন সকালে গ্রামের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে দেখল, পরিত্যক্ত বাড়িটি আর নেই। শুধুই ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে। অরুণবাবু সবকিছু ব্যাখ্যা করলেন। গ্রামে আর কেউ নিখোঁজ হল না।

রহস্যময় সেই রাতের গল্প আজও গ্রামে ছড়িয়ে আছে।

Bagmick Samanta
VIII B

আবার জানালা বন্ধ করে দিলাম। হঠাৎ একটা তীব্র আওয়াজে বুক ধড়ফড় করে প্রাণ বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা হলো। মনে হলো না মেঘগর্জন, নিশ্চয়ই কিছু ভেঙে পড়ার আওয়াজ।

আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দেখলাম সূর্যের আলো জানালা দিয়ে প্রবেশ করছে, সকাল ছ'টা বাজে। আবার চেঁচালাম, এবার দাদা এসে দরজা খুলল। কে দরজা বন্ধ করল? আমার দাদা, যখন কারেন্ট চলে গিয়েছিল, তখন ভেবেছিল কেউ নেই আর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। জানতে পারলাম সামন্ত বাবুদের বাড়িতে একটা তালগাছ ভেঙে পড়েছিল।

কীভাবে একটা রাত যে কাটিয়েছি, আমি নিজেও জানি না এখন।

Aritra Sikdar
X B

আমার ছোট্ট ইচ্ছেগুলো

ছোট্ট আমি, বড়ো স্বপ্ন,
ইচ্ছেগুলো রঙিন।
একদিন হবে আকাশ ছোঁয়া,
পাবো নতুন দিন।

খেলাধুলা আর পড়াশোনা,
বন্ধুর সাথে হেসে।
জীবনের পথে হাঁটব আমি,
নতুন আলো মেশে।

ছোট্ট ছোট্ট ইচ্ছেগুলো,
মনের কোণে লুকায়।
একদিন সব সত্যি হবে,
স্বপ্ন তখন উড়ায়।

Amandeep Chatterjee
VIII B

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র পরিচয়

"সিনেমা হল মানুষের জীবনের প্রতিফলন।"

- সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়, বাংলা চলচ্চিত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। তার চলচ্চিত্র শুধু বাংলাতেই নয় বিশ্বের সিনেমা জগতেও একটি অনন্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। রায়ের সিনেমা গুলির রূপ, গল্প চিত্রায়ন ও সঙ্গীত – সবই ছিল অসাধারণ। তিনি বাংলা সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাস নিয়ে সিনেমা তৈরী করেছেন, যা বিশ্বব্যাপি প্রশংসিত হয়েছে।

মানিক বাবুর প্রথম চলচ্চিত্র ছিল,'পথের পাঁচালী'(১৯৫৫)। এই চলচ্চিত্রের সাফল্যের পর তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। 'অপরাজিত'(১৯৫৬),'অপুর সংসার'(১৯৫৯)– এই তিনটি চলচ্চিত্রকে মিলিয়ে 'অপু ত্রয়ী' বলা হয় যা বিশ্ব সিনেমার একটি মাইলফলক। এই ত্রয়ীতে তিনি বাংলার গ্রামীণ জীবন, মানুষের আবেগ অনুভূতি ও একটি পরিবারের গল্প অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন।

'জলসাঘর' (১৯৫৮) চলচ্চিত্রে রায় শহরের জীবন, বুদ্ধিজীবী সমাজের দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন।'দেবদূত' (১৯৬০) একটি রোম্যান্টিক গল্প, যেখানে তিনি প্রেম, বিবাহ, সমাজের চাপের মধ্যে মানুষের জীবনকে তুলে ধরেছেন।'মহানগর' (১৯৬৩) শিল্পী জীবনের সংগ্রাম, শহরের পরিবর্তন, মানুষের মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন।

'চারুলতা' (১৯৬৪) একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার, যেখানে একজন মহিলার মানসিক অস্থিরতা এবং তার প্রভাবকে তুলে ধরা হয়েছে।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৯) একটি শিশুদের জন্য তৈরি স্বপ্নময় চলচ্চিত্র, যেখানে রায়ের কল্পনাপ্রসূত জগৎ প্রকাশ পেয়েছে। 'সোনার কাঠি' (১৯৭০) একটি রূপকথার গল্প, যেখানে সরলতার জয়গাথা তুলে ধরা হয়েছে।

'শতরঞ্জের খোয়া' (১৯৭৭) একটি রোম্যান্টিক গল্প, যেখানে প্রেম, বিশ্বাস, মানুষের মনোবিজ্ঞান তুলে ধরা হয়েছে। 'হীরক রাজার দেশে' (১৯৮০) একটি রূপকথা, যেখানে সত্য, ন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গল্প বলা হয়েছে।

রায় শুধু পরিচালকই ছিলেন না, তিনি নিজেই ছিলেন চিত্রনাট্যকার, গল্পকার, চিত্রগ্রাহক, সঙ্গীত পরিচালক, এমনকি কণ্ঠ দানও করেছেন। তাঁর সিনেমাগুলির সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং স্মরণীয়। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গীতের দিকেও একটি নতুন মাত্রা এনেছিলেন।

রায়ের সিনেমাগুলির সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে তার চিত্রায়নে। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ক্যামেরার ভাষায় অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সিনেমাগুলির রঙিন দৃশ্যগুলি আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র শুধু বিনোদনই নয়, তা মানুষের জীবন, সমাজ, মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তাঁর সিনেমাগুলি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং দর্শকদের মন মুগ্ধ করে চলেছে। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি স্বর্ণযুগ স্থাপন করে গেছেন, যার প্রভাব আজও অনুভূত হচ্ছে।

Himadyuti Bhattacharya
XA

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী

রহস্যের মুখ থেকে যে সততা ছিনিয়ে নিতে পারে তাকে বলে ব্যোমকেশ বক্সী । সে শুধু অপরাধী নয় বরং প্রতেক ঘটনার পিছনের লুকিয়ে থাকা সত্য কে সবার সামনে তুলে ধরে । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট চরিত্র হিসেবে ব্যোমকেশ বক্সীর পরপর কয়েকটি খুনের ঘটনার কিনারা করতে 'বে-সরকারী ডিটেকটিভ' ব্যোমকেশ বক্সী পুলিশ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে অতুলচন্দ্র মিত্র ছদ্মনামে এই অঞ্চলে এক মেসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই মেসে তার ঘরের অন্য ভাড়াটিয়া অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে শরদিন্দদু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশের অধিকাংশ গোয়েন্দা গল্পগুলি লিখিয়েছিলেন। তার বিচারশক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সে জটিল সমস্যার কিনারা বের করেছে ।

ব্যোমকেশ বক্সী, কল্পনায় ও বাস্তবতায় এক অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত গোয়েন্দা, যাঁর কোনো দ্বিধা বা ভয় নেই। শুদ্ধ ও পবিত্র সততার সঙ্গে প্রতিটি রহস্য সমাধান করতেই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। এর মধ্যে তাঁকে কখনোই কোনো দুর্ভেদ্য বাধার সম্মুখীন হতে দেখা যায় না, বরং তিনি সেই বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যান তাঁর অনুসন্ধানে। তবে, তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—সে কখনোই কোনো একক সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। সব সময়ই বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করেন, আর সেই বিশ্লেষণের গভীরতা প্রমাণিত হয় প্রতিটি গল্পের গূঢ় রহস্যে।

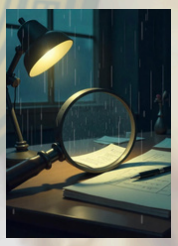

একজন সাহসী, তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও সমালোচক
গোয়েন্দার মতোই বোমকেশের রয়েছে দুর্দান্ত পর্যবেক্ষণ শক্তি।
তার চোখের ভাষা, তার সিদ্ধান্তের সঠিকতা, প্রতিটি
ঘটনাকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা
তাঁকে অন্য যে কোনো গোয়েন্দার চেয়ে আলাদা করে তোলে।

তবে, ব্যোমকেশ বক্সী যে শুধুমাত্র তার বুদ্ধি দিয়েই কাজ করেন তা নয়, তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁর চরিত্রে মানুষের প্রতি এক গভীর সহানুভূতি ও দয়া প্রতিফলিত হয়।

ব্যোমকেশের গল্প পড়ে এটাই বোঝা যায় যে সৎসাহস থাকলে সত্য কে উদঘাটন করে তা সবার প্রকাশে আনা সম্ভব। যুগে যুগে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে বাঙালি বিশ্বের কোনো জাতির থেকে মেধায় ও বুদ্ধিতে কম নয়।

Aarush Paul
VIII B

দ্য একেন

'দ্য একেন' (২০২২) একটি বাংলা ডিটেকটিভ ক্রাইম ফিল্ম, যা সুশান দাসগুপ্তের জনপ্রিয় ডিটেকটিভ চরিত্র একেন্দ্র সেন (একেনবাবু) এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন জয়দীপ মুখার্জি, এবং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী.

কাহিনীর শুরুতে, একেনবাবু তার বন্ধু বাপি ও প্রমথের সঙ্গে দার্জিলিংয়ে অবকাশ যাপনে যান। সেখানে তাদের পরিচয় হয় চলচ্চিত্র তারকা বিপাশা মিত্রের সঙ্গে, যিনি তার দাদুর একটি অমূল্য ছবি এবং মূল্যবান একটি টিকিট খুঁজে পেতে একেনবাবুর সাহায্য চান। এছাড়া, বিপাশার বন্ধু দেবরাজ সিং একেনবাবুকে একটি খুনের মামলায় সহায়তা করতে অনুরোধ করেন। কিছুদিন পর, বিপাশার মূর্তির সংগ্রহ থেকে একটি ভিষ্ণু মূর্তি চুরি হয়ে যায়। একেনবাবু সন্দেহ করেন যে, এই ঘটনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তিনি স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় তদন্ত শুরু করেন। ধীরে ধীরে, নতুন তথ্য উঠে আসে, যা রহস্যকে আরও জটিল করে তোলে। অবশেষে, একেনবাবু তার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার মাধ্যমে সমস্ত রহস্য উদঘাটন করেন এবং অপরাধীদের ধরেন।

চলচ্চিত্রটি দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া ছবিটিকে ৪/৫ রেটিং দিয়েছে, যেখানে একেনবাবুর হাস্যরসাত্মক চরিত্র এবং অনির্বাণ চক্রবর্তীর অভিনয়কে প্রশংসা করা হয়েছে। সিনেস্টান-এ রোষিণী সরকার ২/৪ রেটিং দিয়ে বলেছেন, চলচ্চিত্রের টুইস্টগুলো অনেক ছিল, তবে লেখার দিক থেকে দুর্বল ছিল এবং টুইস্টগুলোর বাস্তবায়ন কিছুটা বিরক্তিকর ছিল।

তিনি মুকোপাধ্যায় এবং ঘোষের অভিনয়কে প্রশংসা করেছেন, তবে অন্যান্যদের অভিনয়কে সমালোচনা করেছেন।
'দ্য একেন' চলচ্চিত্রটি ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল মুক্তি পায়, যা বাংলা নববর্ষের সঙ্গে মিলে যায়। চলচ্চিত্রটি বক্স অফিসে সফল হয় এবং দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

Aarush Bhattacharya
VIII B

শালিক

এক যে ছিল শালিক
বট গাছটি কিনে সে তার
হয়েছিল মালিক।
গাছের যত কোটোর ছিল,
শালিক সেসব ভাড়া দিলো।
হাঁটতো, চলতো, হেলতো, দুলতো বাড়িওয়ালার মতো।
হুলোবিড়াল ভাড়াছিলো নিচের কোটরে,
খিদের সময় চিবিয়ে খেলো শালিক ভায়ারে।

Shankhin Ghosh
I B

মাটির সুর

বাংলার মাটি ভরপুর,
সরিজারি, ভাটিয়ালি সুর।
বাউল গানের সুরে সাধা
একতারাটির তারটি বাঁধা।

নদীর ঢেউয়ে ওঠে বোল,
যেন ধামসা-মাদল।
সোনাঝুরি-শালপিয়ালের বন,
দোয়েল-ফিঙে-শ্যামা পাখির কূজন।

ভোরের ভৈরব ধরে উত্তরে কাঞ্চন,
নীচে সাগর শোনায় সন্ধ্যার ইমন।
মন্দিরে মন্দিরে বাজে শঙ্খ-কাঁসর,
গির্জায় ঘণ্টা, মসজিদে আজানের স্বর।

মায়ের আঁচলে এক সুরে বাঁধা
মোদের বহতা জীবন,
বাংলার ঘরে যত ভাইবোন
তাইতো মোরা এক প্রাণ, এক মন।

Aditya Vikram Gupta
VIII A

মহামারীর আঘাতে স্তব্ধ বিশ্ব

সালটা ২০১৯। শোনা যাচ্ছিল চীনে বহু
মানুষ কোনো এক অজানা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে।স্পেন ও ইতালি তেও এই ভাইরাস ছড়ায়। তার সঙ্গে ছড়ায় ব্যাপক হারে আতঙ্ক ও ধন্দ। শুরু হয় মৃত্যুর মিছিল। ২০২০ সালে ভারতে প্রবেশ করে এ মারক ভাইরাস যার নাম
কোরোনা এবং অসুখটি হল কোভিড ১৯। প্রতিটি মানুষের জীবনে শুরু হলো ভয় ও অজানা আতঙ্কের সাথে এক নতুন যুদ্ধ।
খুব দরকার না থাকলে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করা হলো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার থেকে । অন্তর্জাল-এর মাধ্যমে আর্থিক আদান প্রদান, পড়াশুনো,বিভিন্ন রকম শিক্ষাদান, পরীক্ষা গ্রহণ, চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ সহ এমন বহু কাজ হতে থাকলো যার কল্পনাও করেনি সাধারণ মানুষ। হাওয়ায় এই জীবানু ছড়ায় বলে খুব তাড়াতাড়ি বহু সংক্রমণ হতে থাকল।হাসপাতাল গুলোয় রোগী ভর্তি করার জায়গা কম পড়ছিল। বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, জীবানু নাশক তরল পদার্থ ব্যবহার করা ও নাক মুখ ঢাকা মুখোশ পরা বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। বাড়ীতে বদ্ধ থেকে হাজার হাজার মানুষের কষ্ট ও মৃত্যুর খবর শুনে মনে কষ্ট বাড়তে লাগলো।

বিশ্ব জুড়ে এমন এক মহামারীর দাপটে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গেলো।যেসব লোকেরা অন্য রাজ্যে কাজে গেছিলো তারা অনেকে অনেকে বাড়ি ফিরে এলো কিন্তু যাদের টাকা কম ছিল তারা অনেকে ফিরতে পারেনি।সরকার থেকে এবং অনেক সংস্থা থেকে খাবার ,ওষুধ, মুখোশ দেওয়া হয় বিনামূল্যে।কিন্তু খবরে শোনা যাচ্ছিল বহু গরীব শ্রমিক যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকার কারণে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ চলে বাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করছিল..... অনেকে পৌঁছেছে আবার অনেকে পথেই অসুস্থ অবস্থায় থেমে গেছে। অনেকে আবার মারা ও গেছে।

বিদ্যালয়ে যেতে না পারা, বন্ধুদের সাথে কথা বলতে আর খেলতে না পারা, বেড়াতে যেতে না পারা মনটা খারাপ করে দিচ্ছিল। তার সঙ্গে খবরে শোনা যাচ্ছিল প্রতিদিন কিভাবে আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে, কোনো ওষুধ আবিষ্কার করতে পারা যাচ্ছিল না, শ্মশানে সৎকারের জায়গা পাওয়া যায়নি বলে অনেক জায়গায় রাস্তার পাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে সেখানে দাহ করা হয়েছে এই রোগে মৃত বহু মানুষদের। এসব শুনে মনে ভয়, কষ্ট আর অনেকটা খারাপ লাগা জমতে থাকছিল। কিছু না করতে পারায় অসহায় বোধ করছিলাম। কতো মানুষ তাদের প্রিয়জনদের হারালো,কতো বাচ্ছা অনাথ হয়ে গেল তার হিসেব নেই।
শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রতিরোধক ওষুধ আবিষ্কার হলো ভারতে.....স্বস্তি পেল গোটা বিশ্ব। কমতে থাকে রোগের প্রকোপ, রোগীর সংখ্যা আর অবশেষে রোগমুক্ত হলো বিশ্ব। আমার মতো অনেকের মনে রইলো কখনও ভুলতে না পারার মত একটা অভিজ্ঞতা।

Swodeep Dutta
VIII A

হাওড়া প্ল্যাটফর্ম নঃ ১৪

আপনারা সবাই নিশ্চয়ই বেগুনকোদর রেলওয়ে স্টেশনের কথা শুনেছেন এবং ভারতে এর মতো আরও অনেক কিছুর কথা শুনেছেন কিন্তু হাওড়ার ওল্ড কমপ্লেক্সের 14 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ভুতুড়ে গল্প শুনেছেন? প্ল্যাটফর্ম অন্যদের তুলনায় একটু ফাঁকা ছিল. সেই সময় এটিই ছিল শেষ প্ল্যাটফর্ম। হাওড়া থেকে আসামের বারবালি যাচ্ছিলাম। আমি আমার খালার কাছে যাচ্ছিলাম। আমার বাবা-মা আগের দিন সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়ার জন্য আমাকে আমার পরীক্ষা শেষ করতে হয়েছিল। তাই আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আমার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এটি 11:55 pm জন্য নির্ধারিত ছিল. আমি 11:00 নাগাদ স্টেশনে ছিলাম দেখতে যে ট্রেনটি আগামীকাল সকাল 5 টার জন্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে এবং সমস্ত ডরম দখল করা হয়েছে। তাই স্টেশনেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। বারোটা নাগাদ প্লাটফর্ম অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ বৈদ্যুতিক সার্কিট হয়ে বিদ্যুৎ চলে যায়। আমি একাই বসে ছিলাম মাঠটির পাশে ঠান্ডায় প্রায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। আগামীকালের সূর্যের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। হঠাৎ অন্ধকারে প্ল্যাটফর্মের কাছে একটি বিন্দুর মতো একটি ছোট আলো এসে দাঁড়াল। এটি ঝিকিমিকি করে আমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি এখন লোকটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। পুরানো রেলওয়ের ইউনিফর্ম পরা একজন অতি বৃদ্ধ লোক, যার গায়ে লেখা স্টেশন মাস্টারের খোসা ছাড়ানো অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করছে। তার সাথে একটি পুরানো ধাঁচের লণ্ঠন ছিল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'ভাই, এই অন্ধকারে আর স্যাঁতসেঁতে এখানে কি করছেন' তাকে আমার সমস্যাগুলো বোঝানোর পর সে আমার পাশে বসল, একটা পুরনো ধাঁচের সিগারেট ধরিয়ে দিল। বৃদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেও ঠান্ডা আমাকে তা করতে দেয়নি।

এটা আবার অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে ওঠে. আমি লাইটারের ব্যবহার করে সিগারেট জ্বালাতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'ভাই, তুমি কি পড়ো' 'মেডিসিন' আমি উত্তর দিলাম। তিনি আমাকে তার হাতে একটি গুরুতর ক্ষত দেখালেন এবং আমাকে তাকে সাহায্য করতে বললেন। সাথে সাথে, আমি ক্ষতটির চারপাশে একটি ব্যান্ডেজ এবং অন্যান্য ওষুধগুলি মুড়ে দিয়েছিলাম শুধুমাত্র হাসিমুখে ধন্যবাদ পাওয়ার জন্য।' আপনি এটি কীভাবে পেলেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'শুধু একটি ছোট দুর্ঘটনা আর কিছু নয়। তাই আমি কিছু জিজ্ঞেস না করে সিগারেট টানতে লাগলাম। আমরা বসে আছি এমন সময় একজন বৃদ্ধ মহিলা ভিক্ষা চাইতে এলেন। লোকটি কিন্তু মহিলাটিকে তাড়িয়ে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন এমন করলেন'। লোকটি উত্তর দিল না এবং আমরা চুপচাপ বসে রইলো ভোর হয়ে গেল আর লোকটা স্টেশনে এসে পড়ল, 'ভাই, তুমি নিজের সাথে কথা বলছো'। আমি মুচকি হেসে তাকে লোকটার কথা বললাম এবং হঠাৎ সে একটা পানির বোতল বের করে আমার গায়ে স্প্রে করলো কেন, সে উত্তর দিল, "এই প্লাটফর্মের কোনো স্টেশন মাস্টার নেই কারণ 1934 সালে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গিয়েছিল। একজন বৃদ্ধ মহিলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।' কে ছিলেন স্টেশন মাস্টার?

Aadipto Som
VIII A

ঘড়ির কথা

ঘড়ি চলে টিক্ টিক্,
বলতে থাকে ঠিক ঠিক।
এমন করে বৃথা সময়
কাটিয়ে দিও না।

যত আছে ভাই বোন,
যত আছে এ স্বজন ,
সবাই ফেলে যাবে একা,
কেউ তো রবে না ।

ঘড়ি বলে আমি ভাই,
চলি সদা টিক্ টিক্
কখনও না বসে থাকি
সময় রাখি ঠিক ঠিক।

ঘড়ি চলে টিক্ টিক্ টিক্ ।

Krishab Ghosh
I A

বন্ধুত্ব

‘বন্ধু তুমি, বন্ধু আমার
বন্ধু হয়ে থেকো,
তোমার মনের দরজাখানি
বন্ধ নাহি রেখো।
ভোর আকাশে রবির কিরণ
রাতে চাঁদের আলো,
বন্ধু থাকায় দিনগুলি মোর
ছিল বড়ই ভালো।‘

মানব সম্পর্কের সকল বন্ধনের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও আত্মার শক্তিশালী বন্ধন হল বন্ধুত্ব। দেখা গেছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব মানুষের সুখের কারণ হয়। স্নেহ, সহানুভূতি, সততা, বোঝাপড়া আর সমবেদনার অপর নাম হল বন্ধুত্ব। একে অন্যের খুশিতে আনন্দের ভাগ নেওয়ার পাশাপাশি দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার নাম বন্ধুত্ব। বন্ধু হল যাকে না ভেবে কথা বলা যায় মন খুলে, হেসে গড়িয়ে পড়া যায়, আবার চূড়ান্ত পাগলামিও করা যায়। বন্ধুত্বের কোনো বয়স হয় না। আত্মার সঙ্গে আত্মার টানই এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি। বন্ধু আমাদের রোজকার জীবনে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়, দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করে। নিত্যকার জীবনের চাপের মধ্যে বন্ধুর হাতছানি খুশির হাওয়া বয়ে আনে। যেহেতু আমরা সকলেই আজকের দিনে ব্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করি, তাই প্রকৃত বন্ধুত্বের চাষ করা ও সময়ান্তরে তাকে লালন করা অপরিহার্য। তবেই সে বন্ধুত্ব আজীবন স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই অবশ্যই বলা যায় –

‘বন্ধু মানে
No Thanks No Sorry
বন্ধু মানে
Fun is very very
বন্ধু মানে আমি আছি তো
Don’t worry.‘

Debaditya Roy
VI A

আমার ভ্রমনের অভিজ্ঞতা

যথাযথ স্থান নির্বাচন একটি সুন্দর ভ্রমনের অভিজ্ঞতা লাভের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাহাড়,নদী ও সমুদ্র এই সবই আমার অত্যন্ত পছন্দের জায়গা। এবার আমার পরিবার দার্জিলিং ভ্রমনের স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম।১২ই এপ্রিল ২০২৪ তারিখে দার্জিলিং ভ্রমনের জন্য বাবা মার সাথে বেড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে ট্রেনে চেপে নিউজলপাইগুড়ি এলাম। সেখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে বিকেল ৫টা দার্জিলিং এসে পৌঁছলাম। মেঘলা আকাশ খুব ঠান্ডা বোধ হতে লাগল। দার্জিলিং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমাদের সকলের মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। এখানকার বাড়ি ঘর গুলো সাজানো ছবির মত সুন্দর দেখায়। এই কুয়াশা তো একটু পরেই রোদ। বিচিত্র আবহাওয়া এখানে। কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে সূর্যোদয় দেখা এক ভাগ্যের ব্যাপার। পৃথিবীতে যে এত সুন্দর কিছু আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।কত বিচিত্র রঙের বাহার।ম্যালের দৃশ্যের তুলনা হয় না।ম্যালের ঘোড়ায় চড়লাম।একটু ভয় পেলাম ঠিকই কিন্তু এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ভ্রমনের দ্বিতীয় দিনে আমরা দার্জিলিং এর চা বাগান দেখতে গেলাম। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে এখানকার অধিবাসীরা চা চাষ করে থাকেন তা আমাদের সকলকে অবাক করে দিলো। দার্জিলিংয়ের এই চা তার অতুলনীয় স্বাদ ও গন্ধের কারণে ভারতবর্ষে তো বটেই ভারতের বাইরে ও বিশেষ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

এইভাবে কয়েকদিন প্রকৃতির কোলে কাটিয়ে আমারা নিজেদের জীবনে ফিরে আসলাম। এই ভ্রমনে আমি অনুভব করতে পারলাম দার্জিলিংকে দেওয়া পাহাড়ের রাণী উপাধিটি মোটেই অতিশয় উক্তি নয়।

Swarnendu Roy

V B

বিশ্বজয়ের সেই দিন

২০২৪ সালে জুন মাসে আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপে বিজয়ী হয়েছিল। বিশ্বজয়ের সেই দিনটি আমার জীবনের অন্যতম একটি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই ভারত ওই টুর্নামেন্টে খুব ভালো খেলছিল । গ্রুপ পর্যায়ে এক উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয়। সেই ম্যাচের শেষে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম ।গ্রুপ পর্যায়ে অপরাজেয় থেকে ভারত সুপার এইটে উঠেছিল । সুপার এইটে ভারত অস্ট্রেলিয়ার মতো ক্রিকেট মহাশক্তিকে অনায়াসে পরাজিত করেছিল।এই পর্যায়ে ভারত অপরাজেয় থেকে সেমিফাইনালে উঠে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল।সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে অনায়াসে হারিয়ে ভারত ফাইনালে সাউথ আফ্রিকার মুখোমুখি হয়েছিল। ২৯শে জুন, ২০২৪,শনিবার ছিল সেই ঐতিহাসিক ফাইনালের দিন।১৭ বছর পর ভারতের কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফের চ্যাম্পিয়ন হবার সুযোগ এসেছিল। ফাইনালের দিন সকাল থেকেই আমি ম্যাচটা নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলাম। বাবা সকালবেলা দুটো ইন্ডিয়ার জার্সি কিনে এনেছিল।

সন্ধেবেলা আমরা সবাই টিভির সামনে বসে পড়েছিলাম ।আমার দুজন বন্ধু আমাদের বাড়িতে খেলা দেখতে এসেছিল। আমি আর বাবা দুজনে ইন্ডিয়ার জার্সি পড়ে খেলা দেখতে বসেছিলাম। আমার বন্ধু দুজনেও ইন্ডিয়ার জার্সি পড়েছিল ।আমরা বারান্দাতে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ টাঙিয়ে ছিলাম। টসে জিতে ইন্ডিয়া প্রথমে ব্যাট করে গ্রেট কোহলির ব্যাটে ভর করে ১৭৬ রান করেছিল। বিরতিতে আমরা এই ম্যাচটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল ঐ পিচে এই রানটা যথেষ্ট ।আমরা মনে হয় অনায়াসেই ম্যাচটা জিতে যাব।মা এই সময় আমাদের গরম পকোড়া রান্না করে দিয়েছিল । তার সাথে ছিল বাটার পপকর্ন আর কফি।পপকর্ন আর কফি সহযোগে আমরা সাউথ আফ্রিকার ব্যাটিং দেখা শুরু করলাম।জয়ের আশায় আমরা সবাই মশগুল ছিলাম কিন্তু খেলা যত এগোতে থাকল ছবিটা বদলাতে শুরু করল । সাউথ আফ্রিকানরা ধীরে খেলার রাশ নিজেদের হাতে তুলে নিল। ভয়ংকর ক্লাসেন আর মিলারের ব্যাটিং দাপটে ভারত ম্যাচটা প্রায় হেরেই বসেছিল।পরাজয়ের আশঙ্কায় আমরা সবাই তখন খুব মনমরা হয়ে গেছিলাম। ঘরে তখন পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। আমি মনে ভাবছিলাম এবারেও আর জেতা হবে না।'। ঠিক সেই সময় ঘটে সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা । বাউন্ডারি লাইনে বাজপাখির মত উড়ে এসে ক্যাচ ধরে মিলারকে আউট করে সূর্য ।আর এরপরেই ভারত ম্যাচে প্রবলভাবে ফেরত আসে।

স্লগ ওভারে পান্ডিয়ার আঁটোসাঁটো বোলিং এবং বুম বুম বুমরার বিষাক্ত ইয়ার্কারের সৌজন্যে ভারত সাউথ আফ্রিকাকে ১৬৯ রানে আটকে দেয়। ভারত ম্যাচটা ৭ রানে জয়ী হয়।
২০১৭ এর পর ভারত আবার টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়।শেষ বলটা হবার সাথে আমরা সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠি।সকলে তখন ভারতীয় প্লেয়ারদের নামে চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। আশপাশের বাড়ি থেকে আনন্দ উল্লাস, শাঁখের আওয়াজ, এসব শোনা যাচ্ছিল। কিছু ছেলে রাস্তায় নেমে বাজি ফাটাচ্ছিলো। আমরাও সকলে ছাদের গিয়ে অনেক বাজি ফাটিয়ে ছিলাম।চারিদিকে সবাই খুব আনন্দ করছিল। আমরাও খুব আনন্দ করেছিলাম। ওই রাতের উদযাপনের কথা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না ।

Ryan Chakroborty
V B

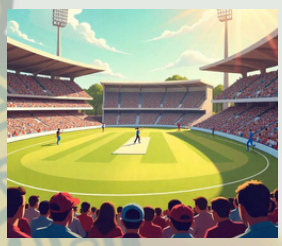

একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

গতবছর এপ্রিল মাসে আমি মা আর বাবি র সাথে আন্দামান ঘুরতে গিয়েছিলাম,এটা আমার সবথেকে প্রিয় ঘোরা ছিল,আমি প্রথমবার প্লেনে উঠবো বলে খুব আনন্দিত ছিলাম, প্লেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মেঘেদের খেলা দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল,তারপর আন্দামানে পৌঁছে আমরা কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম আন্দামান কে নিজেদের মতো করে খুঁজে নিতে,এর আগেও আমি সমুদ্রে ঘুরতে গিয়েছিলাম কিন্তু এখানের মতো এত সুন্দর নীল জল আমি কোথাও দেখিনি, সবথেকে আনন্দের দিনটি ছিল নীল আইল্যান্ডে এ গিয়ে স্নোরকেলিং এর অভিজ্ঞতা । গভীর সমুদ্রে বোট এ করে পোঁছনোর পর যখন জলে নামিয়েছিল তখন যেমন ভয় ও লাগছিল তার থেকেও অনেক বেশি নতুন জিনিস আবিষ্কার এর উত্তেজনায় মন টা খুশি তে ভরে উঠেছিল,তারপর গভীর সমুদ্রের নিচে অসম্ভব সুন্দর বিভিন্ন মাছ,নানাধরনের নাম না জানা গাছ, ফসিলস্ এই সব দেখে আমি ভুলেই গেছিলাম যে আমি সমুদ্রের এত গভীরে আছি।এটা ছাড়াও আমি আরো অনেক রকম ওয়াটার একটিভিটি করেছিলাম কিন্তু সমুদ্রের নিচে দেখা সৌন্দর্য আমার দেখা এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা ।

Aahan Roy
V A

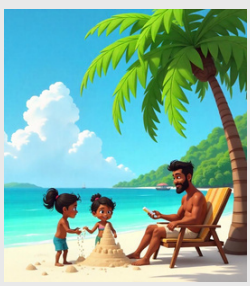

কলকাতা নয়

আমার বাড়ি গড়পাড়ে। এটি উত্তর কলকাতার একটি আদি এবং বনেদি পাড়া। দাদু বলে এখানে এখনও পুরনো শহরের গন্ধটা আছে। এখানে মহান চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা কেটেছে। তার লেখা ফেলুদা গল্পের জটায়ুর বাড়ি ও এই গড়পাড়ে। বাবার সঙ্গে এখানকার কত অলিগলি ঘুরে দেখেছি।

বাড়ির কাছই খেলার মাঠ। আর মাঠের রেলিং এর ধারে রোজ কত লোক, ফেরিওয়ালা বসে। বন্ধুদের সঙ্গে ছুটির দিনে বিকেলে ফুটবল খেলি। সামনের বড় রাস্তার ওপর ট্রাম লাইন আছে। যদিও এখন আর আগের মত ট্রাম চলে না। এখান থেকে আমার স্কুল এখান থেকে বেশি দূরে নয়। বাড়ি ফিরেই মন ভালো হয়ে যায়।

বড় রাস্তার ওপারে বসুবিজ্ঞান মন্দির, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ আর এপারে লেডিস পার্ক, নান্দীকার নাট্য দলের স্কুল, প:ব: মূক ও বধির বিদ্যালয়।আমি কোথাও গেলেও এই পাড়া এই বাড়ির জন্য আমার মন কেমন করে। এই শহরের এত ভীড়েও ও আমি ঠিক খুঁজে পাই আমার ঠিকানা: কলকাতা নয়, আমার কলকাতা। ....

Aushman Kumar

IV B

ওরে বাবা... বাঘ মামা !!!

” ঝুপ! কি যেন একটা জলের ওপর পড়লো I
চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার I পরিষ্কার করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না I কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও দুটো কি যেন জ্বলজ্বল করছে I সবার নজর ওই দিকেI
রাত তখন প্রায় ১ টা I রাত এর খাওয়া দাওয়া সবার ১১ টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে I কেউ বা ঘুমিয়ে পড়েছে আবার কেউ বা রাতের প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছে I
শীতের ছুটিতে ডিসেম্বরের একদম শেষ কয়েকটা দিনে আমরা সবাই সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছি I লঞ্চে করে দুদিন বেশ সুন্দর ঘুরছি I তার সঙ্গে সুন্দর সুন্দর খাওয়া-দাওয়া তো চলছেই I ঠান্ডা শিরশিরে হওয়া আর সাথে শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে বেশ ভালো লাগছে লঞ্চের ডেকে বসে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে I চারিদিক ম্যানগ্রোভ গাছে প্রকৃতি সাজানো I আমি বইতে এই গাছের ছবি দেখেছি কিন্তু চোখের সামনে এই প্রথম দেখলাম এই গাছ I কাল আমরা অনেক হরিণও দেখেছি I ছবি তুলেছি মায়ের ফোনে I
যাক, এইসব সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের সাথে ভাগ করে নিতে বেশ ভালো লাগছে I কিন্তু এখন তো আমার বেশ ভয় করছে I সেই দুটি চোখ তো আমাদের লঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে আসছে I আমাদের দলের সবাই লাঠি বা হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই নিয়ে তৈরি হচ্ছে বাঘের সাথে মোকাবিলা করবে বলে I
আমি ভয়ও পাচ্ছি আবার বাঘ কে সামনে থেকে দেখার ইচ্ছা ছাড়তেও পারছিনা I খুব তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে I আমাদের লঞ্চ ও এগিয়ে চলেছে কিন্তু বাঘের গতির সাথে পারছেনা I

এই করতে করতে একটা সময় বাঘটা একদম আমার মুখোমুখি –
আমার থেকে কেবল একহাত দূরে I
তার মুখটি বিশাল, মনে হল এই বুঝি আমি আস্ত ঢুকে যাবো I
হালু উউউউউমমমম .....
তার থাবাটি তুলে ঠিক আমার মুখের উপর I
ব্যাস..... সব নিস্তব্ধ ..... সব শেষ
.....

"প্রিন্স ..... এবার ঘুম থেকে ওঠ.....
আজ রবিবার বলে আর কত ঘুমাবি ? "
মায়ের ডাকে আমার ঘুম ভাঙলো I
আমি আবার প্রাণ ফিরে পেলাম I ভাগ্যিস বাঘের সাথে স্বপ্নে দেখা হয়েছিল !!!

Kalparoop Das
II A

শুভ্রের স্বপ্ন

শুভ্র ছিল গ্রামের একজন স্বপ্নবাজ ছেলে। তার চোখে সারাক্ষণই মেঘের দল ভেসে বেড়াত, তারুণ্যের ডানা মেলে অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়াত। ছোট্ট ঘরে বসে সে পৃথিবীর নানা রঙের স্বপ্ন দেখতো, নতুন নতুন জায়গা ঘুরে বেড়াত, অজানা রহস্যের খোঁজে ছুটে চলতো।

শুভ্রর বাবা ছিলেন একজন সরল মনুষ্য। তিনি চাইতেন শুভ্র লেখাপড়া করে ডাক্তার হোক। তাঁর মতে, ডাক্তার হলে মানুষের সেবা করা যায়, সমাজে সম্মান অর্জন করা যায়, পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করা যায়। শুভ্রও জানতো বাবার কথা সত্যি। মানুষের সেবা করা একটি পবিত্র কাজ, সমাজে সম্মান অর্জন করা গর্বের। কিন্তু তার মন তো আকাশের দিকে ছুটে চলেছে! সে মেঘের সঙ্গে ভেসে যেতে চায়, নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে চায়, পৃথিবীর গভীরে লুকিয়ে থাকা রহস্য উন্মোচন করতে চায়।

একদিন, গ্রামের বার্ষিক মেলায় শুভ্রর চোখ পড়ল একজন বৃদ্ধ মানুষের হাতে একটি পুরনো, জরাজীর্ণ মানচিত্রের উপর। মানচিত্রটিতে অদ্ভুত সব দেশ, অচেনা সব রাস্তা, দূরবর্তী দ্বীপপুঞ্জ, বিশাল মহাসাগর – যেন পৃথিবীর সব রহস্যই লুকিয়ে আছে সেই মানচিত্রে। বৃদ্ধ মানুষ, যিনি নিজেকে একজন ভ্রমণকারী বলে পরিচয় দিলেন, শুভ্রকে বললেন, 'দেখো ছেলে, এই মানচিত্রে জীবনের সব রাস্তা আছে। তবে পথ খুঁজে বের করতে হবে নিজেকেই। কারণ, সব রাস্তা একই জায়গায় শুরু হয়, কিন্তু গন্তব্য নির্ধারণ করতে হয় নিজেকেই।'

শুভ্র মুগ্ধ হয়ে গেল। বৃদ্ধ মানুষের কথা তার মনে গভীর ছাপ ফেলল। সে বুঝতে পারল, জীবনে অনেক রাস্তা আছে, শুধু খুঁজে বের করতে হয়। সেদিন থেকেই তার মনে একটা আশা জাগল। সে লেখাপড়া করবে, ডাক্তার হবে, মানুষের সেবা করবে, বাবার স্বপ্ন পূরণ করবে। কিন্তু তা করতে গিয়ে নিজের স্বপ্নকেও ভুলে যাবে না। সে জানতো, আকাশে উড়তে না পারলেও, জীবনের রঙিন পথে হেঁটে সে তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। সে লেখাপড়ায় মন দিয়ে পড়বে, কিন্তু পাশাপাশি বিজ্ঞানের বইয়ের পাশাপাশি ভূগোলের বই, ভ্রমণকাহিনী, আবিষ্কারের গল্পও পড়বে। সে জানতো, জীবন একটি দীর্ঘ যাত্রা, এবং সে এই যাত্রায় নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করতে থাকবে।

Sourya Sengupta
VII A

শঠে শাঠ্যং

বন্ধুদের মধ্যে দীপ বরাবরই পিছিয়ে থাকে। যদিও তা নিয়ে ওর নিজের কোন কষ্ট নেই। পড়াশোনায় ভালো না হলেও ওর স্বভাবের জন্য স্কুলের স্যার ম্যামরা ওকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু ওর প্রতি শিক্ষকদের এই ভালোবাসা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না ওদেরই ক্লাসের আরেকটি ছেলে নীল, তাই সব সময় সুযোগ খোঁজে দীপ কে অপদস্ত করার। একদিন টিফিনের সময় নীল একটি পঞ্চাশ টাকার নোট ক্লাসরুমে ফেলে রাখে কারণ ও জানত ওই সময় দীপ মাঠে খেলতে না গিয়ে ক্লাস রুমে থাকে। নীলের অভিসন্ধির কথা না জেনেই দীপ ওর ফাঁদে পা দেয় এবং টাকা তুলে নেয়। নীল দুর থেকে এটা দেখতে পেয়ে মনে মনে আনন্দ পায় ও অপেক্ষা করে কতক্ষণে ম্যামের কাছে নালিশ করবে।

ক্লাসে ম্যাম এলে নীলকে অবাক করে দীপ নিজে থেকেই ম্যামকে টাকাটা দিয়ে বলে ও টাকাটি কুড়িয়ে পেয়েছে। ম্যাম কথাটি শুনে দীপকে বাহবা দেয়, এতে নীল আরো রেগে যায় হঠাৎ করে নীলের মাথায় একটি দুর্বুদ্ধি খেলে যায় ও ম্যামকে গিয়ে বলে যে ওর দুটি ৫০ টাকার নোট হারিয়ে গেছে এবং দীপ একটি নোট নিজে রেখে আরেকটি ম্যামকে ফেরত দিচ্ছে। ম্যাম ঘটনাটি শুনে দীপকে জিজ্ঞাসা করেন যে ও আসলে কয়টি নোট পেয়েছে দীপ ভয় পেয়ে বারবার বলতে থাকে যে ও একটি নোটি খুজে পেয়েছে।

ম্যাম ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বলেন, যেহেতু নীলের দুটি ৫০ টাকার নোট হারিয়েছে এবং দীপ একটি খুঁজে পেয়েছে তাই কখনোই এই টাকাটি নীলের হতে পারে না এটি অন্য কারোর। যতদিন অন্য কোন দাবিদার না আসছে ততদিন ওই টাকা ম্যামের কাছে থাকবে। ক্লাসের সবাইকে ম্যাম বলেন দীপের এই সততার জন্য হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে। সেই দিন ছুটির পর ম্যাম নীলকে ডেকে পাঠান এবং তাকে সাবধান করেন যে ভবিষ্যতে যদি এই ঘটনা আবার ঘটে তাহলে উনি নীলকে উচিত শিক্ষা দেবেন। বাড়িতে ফিরে নীল বাবা মায়ের কাছে বকা খায় পঞ্চাশ টাকা হারানোর জন্য। নীলের এই দুর্বুদ্ধিতার জন্য ও নিজেই বিপদে পড়ে।

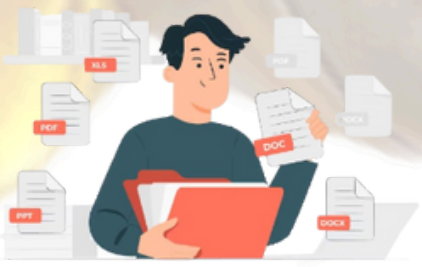

Indranuj Mullick

VI A